Volume: 4 Issue: 6 Pages: 140-143

জাতিয়তাবাদী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর শিক্ষা ভাবনা।

*[1] নেকসাদ খান

*[1] সহকারী অধ্যাপক, বোলপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 24/ May/2025
Accepted: 27/June/2025

***Corresponding Author**
নেকসাদ খান
সহকারী অধ্যাপক, বোলপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract
উনবিংশ শতকে ভারতে উচ্চশিক্ষা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠার ফলে একটি নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, যারা ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম স্তম্ভ ছিল। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল ভারতীয় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন তা কিন্তু নয়, এদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ ছিলেন, যারা সমাজে স্বতন্ত্র চিন্তার ছাপ রেখে গেছেন। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিচারপতি এবং দক্ষ প্রশাসক। তাঁর শিক্ষা নীতি আধুনিক প্রগতিশীল এবং একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার দ্বারা পরিপুষ্ট ছিল। তিনি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র উপনিবেশিক প্রশাসনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, বরং একটি জাতিকে আত্মনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্ক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় চেতনা গঠন সম্ভব। ঔপনিবেশিক শাসকের প্রবল আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও, কিভাবে তিনি তাঁর শিক্ষা ভাবনাকে জাতীয়তাবাদী খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেটাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

Keywords: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা:

উনিশ শতক থেকে ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা সামাজের প্রগতিশীলতার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। আবার এরাই ছিল ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম স্তম্ভ। তবে সকলেই একই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এমন নয়। এদের মধ্যে কয়েকজন ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ ছিলেন, যারা সমাজে স্বতন্ত্র চিন্তার ছাপ রেখে গেছেন। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে হেঁটে বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক ধারায় প্রবাহিত না করে জাতীয়তাবাদী খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন, কলকাতার বৌবাজারের মলঙ্গী পলিতে তিনি জন্ম গ্রাহন করেন। তাঁর বাবা গাঙ্গা প্রাসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিখ্যাত ডাক্তার এবং তাঁর মা জগত্তারিণী ছিলেন একজন আদর্শ মাহিলা।১ আশুতোষ-এর জান্মের পর তাঁর বাবা পুরো পরিবার নিয়ে ভাবানিপুরে চলে আসেন। তাঁর শৈশব শিক্ষা শুরু হয় ভাবানিপুরের চক্রবেরিয়া পাঠশালায়। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল বিজ্ঞান ও সাহিত্যে আচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে। আশুতোষের উপর তাঁর পিতার অসাধারণ প্রভাব ছিল এবং তাঁর চরিত্র গঠনেও বিশেষ ভূমিকা ছিল। জীবন গঠনে তাঁর পিতার বক্তব্য ছিল, তুমি যদি কিছু শেখো তবে তা ভালোভাবে শেখো। তিনি এই পাঠটি তার পুত্রকে দিয়েছিলেন। এছাড়াও আশুতোষের উপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর শিক্ষক মধুসূদন দাসের গভীর প্রভাব ছিল। তিনি ব্যতিক্রমি প্রাতিভা এবং স্বচ্ছ ধারনার অধিকারী ছিলেন। একবার জটিল কিছু শুনলে পরে তিনি তা সহজেই স্মরণে আনতে পারতেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কঠিন গাণিতিক সমস্যাগুলি সহজেই সমাধান করতে পারতেন। ১৮৭৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ডিগ্রী এবং ১৮৮৫ সালে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। পরের বছর তিনি পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে 'ইশান বৃত্তি' এবং ১৮৮৬ সালে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি অর্জন করেছিলেন পড়াশোনায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য। ১৮৯৪ সালে তিনি

ল' এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৮৯৮ সালে ট্যাগোর ল প্রফেসর হন। ১৯০৪ সালে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আইন ব্যবসায় জীবন শুরু করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আইন কে কখনোই ব্যবসা বা কেবল গুরুগম্ভীর কথার কারবার বলে মনে করতেন না, আইন হল বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত একটি বিষয়। আইন সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। আইন চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা তাঁকে একজন বিশিষ্ট ব্যবহার জীবি থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞান চর্চার প্রভাব ভারতীয় শিক্ষার উপর পড়লে, এখানকার শিক্ষার্থীরাও আধুনিক জ্ঞানচর্চায় বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তার অন্যতম ফসল হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি যখন ছাত্র, সেই সময় থেকেই তাঁর লেখা গণিতের উপর গবেষণা পত্র বিদেশের নামি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি 'রয়্যাল সোসাইটি অফ ফ্রান্স' এবং 'ম্যাথ্যামেটিক্যাল সোসাইটি অফ পার্লমোর' মতো মর্যাদাপূর্ণ সমিতির গুলির সাথে ফেলোশিপে যুক্ত ছিলেন । তাঁর নেতৃত্বে 'কলকাতার ম্যাথ্যামেটিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে এবং ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন.২ তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ কাজের জন্য ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে নতুন প্রমাণ এবং ডিফারেন্সিয়াল জ্যামিতিতে অবদান অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণিতে তাঁর অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিশিষ্ট গণিতবিদ গণেশ প্রসাদ ভারতীয়দের মনে করিয়ে বলেন, 'গণিত শাস্ত্রে স্যার আশুতোষ যতটুকু দান করেছেন, সে তার ছাত্র বয়সে একক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। প্রাচীন গণিতবিদ ভাস্করের পরবর্তীকালে তিনি হলেন প্রথম ভারত সন্তান যিনি গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন যা মৌলিক বলেই মূল্যবান'।৩ বিশ্বের দরবারে তাঁর গাণিতিক সূত্র 'Mookhejee's Theorems' নামে পরিচিত।

আশুতোষ মুখার্জি নিছক একজন খ্যাতনামা বিচারক ও আইনবিদ ছিলেন না, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দুই দফায় দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দফায় তিনি ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই পদে স্বগর্বে কাজ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি শিক্ষক নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্ম বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নয়, বরং যোগ্যতা ও প্রতিভার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে পড়ার জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছিলেন। স্যার আশুতোষের মতে গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। শিক্ষকদের অবশ্যই আবাধে চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকতে হবে। তিনি আরো মতামত দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহন না কারলেও, তাঁর অবদান ছিল মৌলিক ও প্রভাবশালী, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তা ও কর্মে যে জাতীয়তাবাদ প্রতিফলিত হয়েছিল, তা ছিল সংস্কৃতিনির্ভর, যুক্তিবাদী এবং ভবিষ্যতমুখী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা গঠন সম্ভব। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মতো বিভাগ চালু করেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক হয়। তিনি সিলেবাস প্রণয়নেও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটান । আশুতোষ মুখোপাধ্যায় "জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় সাহিত্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যাহা কিছু বিদেশী তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশী তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। এখানে তিনি বিদেশী ও দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আশুতোষের মতে, একাধিক ভাষার সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে একটি সমন্বিত জাতীয় সাহিত্য গঠন সম্ভব। তিনি তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার ধারণা প্রবর্তন করেন, যেখানে এক ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষার সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে। এটি ছিল তাঁর বহুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন। বহু প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের কোন একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হবে একথা স্মরণে রেখে তিনি এক ভাষার পরিবর্তে সংহতির জন্য জাতীয় সাহিত্যে জোর দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার উপর জোর দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে নিছক শিক্ষার ভাষা নয়, প্রশাসনিক স্তরে ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সরকারি নির্দেশ নামাকে অমান্য করে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন, তখন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অকুণ্ঠ সমর্থন করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারি কোপে পড়লে, আশুতোষ সমর্থন জানিয়ে বলেন, "তুমি বাংলায় বলে ভালোই করেছ, আমি চাই এখানে সরকারি লেকচার বাংলায় হোক"।৪ তাঁর কাছে জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার প্রধান উপকরণ হল সাহিত্য। তিনি আহ্বাণ জানান বাঙালির যদি বিশ্ব-জগৎএ কালজয়ী হওয়ার বাসনা থাকে তবে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। মাতৃভাষার সৌন্দর্যবোধকে জগৎ-এর মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। আশাবাদী ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নির্বিশেষে বাংলা ভাষার বিস্তার নিশ্চিত হবে।৫ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলন এর উদ্দেশ্যে ১৮৯১ সালে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। তৎকালীন ইংরেজ শাসক, মুসলমান ও সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রবল বিরোধীতায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতমহাশয়গণ আপত্তি করলেন, 'বাংলা ভাষায় পরীক্ষা প্রচলিত হলে সংস্কৃতের মর্যাদা নষ্ট হইবে। 'মুসলমানগণ আপত্তি তুললেন তাঁহাদের ছেলেরা ভাল বাঙ্গালা জানেনা, ভালো উর্দু কিংবা পার্শিও জানে না। তাহারা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই পাস করিতে পারিবে না। সুতরাং এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক সর্বনাশ হইবে।৬ প্রস্তাব নাকচ হওয়ার জন্য আশুতোষ নিরুৎসাহ হন নি। পরবর্তীকালে উপাচার্য পদে এসে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে উদ্যত হন। তাঁর শিক্ষা দর্শনে নারীশিক্ষা প্রসারের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলা যায়। তিনি মনে করতেন নারীর উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন এবং তাদের শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ড নারীদের উপযোগী বিষয়গুলি নির্ধারণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

গণিতে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য, দর্শন ও আইন বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল অবাক করার মতো। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন জাতীয় শিক্ষার প্রসারে বাধার সৃষ্টি

করে। এই আইনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ ইংরেজ সরকারের মনোনীত ইউরোপীয়দের হাতে দেওয়া হয়। তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল প্রশাসন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে কোন রকমের জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও চেতনার স্পর্শ না লাগে সেদিকে নজর রাখা। তাদের আরও চেষ্টা ছিল স্বদেশী বুদ্ধিজীবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজ সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে না দেওয়া। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রচেষ্টাকে আশুতোষ সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অ্যাকাডেমিক ঐতিহ্য স্থাপন করেছে যা আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর কাছে মাতৃ স্বরূপ। আজীবন প্রতিষ্ঠানরূপ মাতার দেহে অলংকার পরিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সদা ব্যস্ত ছিলেন। বিশ্বের দরবারে এই বিশ্ববিদ্যালয় কে উন্নত করেছিলেন। দীর্ঘদিন এখানে তিনি নিভৃত সাধনায় সমাহিত ছিলেন।৭ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার চেয়েছিলেন, বিপ্লব চান নি। সরকার অনুভব করেছিল যে, আশুতোষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ থাকবে, রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে না। ১৯০৬ সালে উপাচার্যের পদ গ্রহণ কালে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধিতা তুঙ্গে। বাংলার মান্যগণ্য মানুষেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গালাগালি দিয়ে বলতেন 'গোলদিঘির গোলামখানা', ব্রিটিশদের চাকর তৈরির জায়গা। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার নেওয়া ছিল তাঁর কাছে অগ্নিপরীক্ষা। ঘরের লোক আর পরের লোক- দুইয়ের চক্ষুশূল হওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তিনি তো আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কুশলতা ও অবিচল দৃঢ়তায় কার্জনের প্রবর্তিত আইনকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। যে প্রতিষ্ঠান ছিল শুধু স্কুল কলেজের পরীক্ষার কেজো যন্ত্র, তাকে প্রদান করলেন দুটি দানা- উচ্চশিক্ষা আর গবেষণা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার জন্য অধ্যাপক নিয়োগ, নিজস্ব গ্রন্থাগার স্থাপন, গবেষণাগার তৈরি ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হয়। তাঁর শিক্ষা ভাবনায় জাতীয়তাবাদ, স্ব-শিক্ষার অধিকার এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও চেতনার প্রতি গভীর নিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়। তিনি পশ্চিমা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতিফলন থাকা উচিত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও চিন্তার স্বাধীনতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর উচ্চ আত্মসম্মান,সাহস এবং এক অসাধারণ অন্তর্নিহিত মনোভাবের জন্য তাঁকে 'বাংলার বাঘ' বলা হয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা কেবলমাত্র পুস্তকজ্ঞান বা পরীক্ষার সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শিক্ষা হওয়া উচিত চিত্ত, মনন ও নৈতিকতার বিকাশের মাধ্যম। তিনি মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয়ে সামগ্রিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পরীক্ষিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে গবেষণা ও নতুন চিন্তার বিকাশে উৎসাহ দিতেন। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা মৌলিক চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটায়। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বইয়ের পাতা ও ডিগ্রীর বাইরেও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তিনি মনে করতেন, মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে জাতীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় দৃঢ় হবে। উপনিবেশিক ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি ও কতৃত্ববাদী শিক্ষার বিরোধিতা করে শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার কথা বলেন। তিন ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে মেধা ও প্রতিভাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন, কোন জাত পাত, ধর্ম বা সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তারা যেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে। পাঠ্যাবস্তায় রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। পাঠ্যাবস্তায় ছাত্রগণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পাঠ করবে; কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না।৮ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে সব শিক্ষক স্কুল কলেজের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময় সক্রিয় রাজনীতি করতে চান, তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে আবেদন করছি দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, জীবনে তাঁরা যে বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তার সঙ্গে জড়িত বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে যেন সবিশেষ অবহিত থাকেন।... এই ধরণের শিক্ষকগণ ছাত্রশ্রেণীর নিরাপদ দিশারী নন, যদি দিশারী বলতে আমরা বুঝি তেমন লোককে যিনি কেবলমাত্র নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েই চালিত ও অনুপ্রাণিত করেন না, বরং নিজের জীবনের আচার আচরণের মারফৎ ছাত্রদের সামনে বাস্তব আদর্শ স্থাপন করেন। যে মহান শিক্ষাব্রতীদের হাতে আমাদের ছাত্র ও যুবশ্রেণীকে তুলে দিয়েছি তাঁরা যেন ভুলে না যান যে তাঁরাই বিদ্যামন্দিরের পুরোহিত। তাঁরা যেন এই নীতিবাক্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন ।৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় হল এক ধরনের জ্ঞানের ভান্ডার, শিক্ষা মানের এক প্রভাবশালীন নিয়ামক, বিরাট যজ্ঞশালা,চিন্তা এবং কাজ করার জন্য একটি বিশাল পরীক্ষাগার হবে। তিনি আরো বলেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি জ্ঞান সংরক্ষণ করা, জ্ঞান, প্রয়োগ করা এবং সর্বোপরি জ্ঞান স্রষ্টা তৈরি করার লক্ষ্য রাখে।১০ তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণা প্রবৃত্তি জাগ্রত এবং সে ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন দেয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত। তাঁর হাত ধরেই একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষা পরিচালনা ও পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্র, শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণের কথা বললেও, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন- আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরি করবার যন্ত্রশালায় পরিণত হতে দেব না। আমরণ সত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাব, স্বাধীন মনোবৃত্তির শিক্ষা দেব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাতে উচ্চভাব ও উচ্চ আদর্শের প্রেরণা লাভ করতে পারে, আমরা সেই রকম শিক্ষা দেব। কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্রেটারিয়েটের দপ্তর দ্বারা আত্মসাৎ হতে দেবনা।১১

পাঠ্যসূচি সংস্কার করলেন, স্নাতকোত্তরে খুললেন নতুন নতুন বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ফলিত রসায়ন, প্রাচীন ভারত ও ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির মতো বিষয়ের শুরু তাঁর চেষ্টাতেই। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু হয়। শুধু তো নতুন বিভাগ খুললেই হবে না, উপযুক্ত শিক্ষকও চাই। তাই তিনি বিদেশী পন্ডিতবর্গদের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, দেশীয় পণ্ডিতদেরকেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জন নয়, বরং এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা মানুষকে উন্নত ও আলোকিত করে। শিক্ষায় একমাত্র জাতির উন্নতি ঘটাতে পারে এই বিশ্বাসটা তাঁর ছিল । তিনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনপাঠন,

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ গড়ে তোলার কারিগর গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক থেকে বিদ্যাচচার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর কর্মকাণ্ডের উচ্ছসিত প্রশংসা করে আচার্য রোনাল্ডসে বলেছিলেন- 'the greatest landmark in the history of the university in recent years is undoubtedly the creation of the council of postgraduate studies'।১২ তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃত শিক্ষা আমাদের মৌলিক চিন্তা ও কল্পনা শক্তিকে প্রসারিত করে। যুক্তিপূর্ণভাবে লেখালেখি, নতুন বক্তব্য তৈরি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজে যুক্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে যথাসম্ভব হাতে-কলমে প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল চিন্তায়, দর্শনে ও কর্মে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন রাজনীতি ছাড়াও জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে, আর তার প্রভাব অধিক গভীর ও সূদূরপ্রসারী।

আশুতোষের সমগ্র চিন্তা ও কর্মের বীজ নিহিত ছিল প্রগাঢ় দেশপ্রেমে, দেশাত্মবোধ এবং দেশহিতৈষনায়। তাঁর শিক্ষানীতি আধুনিক প্রগতিশীল এবং একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার দ্বারা পরিপুষ্ট ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভাষায়- তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল জাতির মঙ্গল চিন্তা'। তিনি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র উপনিবেশিক প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, বরং একটি জাতিকে আত্মনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্ক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আশুতোষ উচ্চ স্ব-সন্মান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি নির্ভীক মন ও উচ্চ প্রশাসনিক সম্ভাবনার অধিকারী ছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামে না জড়ালেও, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের পক্ষে ছিলেন এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কে জাতীয় উদ্দেশ্যের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন সরকারের সঙ্গে বিরোধ হলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯২২ সালে স্পষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার দাবি জানান। তিনি বজ্রকন্ঠে ঘোষণা করেন 'Freedom First, Freedom Second, Freedom Always'। অনেকেই অভিযোগ করেন, আশুতোষের উচ্চশিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এই অমূলক অভিযোগের উত্তরে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন- উচ্চ শিক্ষার উপর জোর না দিলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের জন্য শিক্ষক পাওয়া যাবে কোথায় ? যে মুষ্টিমেয় লোক আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুফল একচেটিয়া ভোগ দখল করছে, তারা মনে প্রাণে চাইতেন যেন তার ভাগীদার না জোটে।

তাই তারা 'শিক্ষা রসাতলে গেলবলে শোরগোল তুলেছিল। ১৯২১ সালের ৪ এপ্রিল তিনি কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে পুনরায় নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মামলার কাজে আশুতোষ পাটনা- কলকাতা করছিলেন, সেই পাটনাতেই হঠাৎ অসুস্থ হন এবং 1924 সালের ২৫শে মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর দুদিন পরের আনন্দ বাজার পত্রিকার হেডলাইনে লেখা হয়েছিল, 'বাঙ্গলার নরশাদ্দূল আশুতোষের মহাপ্রয়াণ।১৩ বিদ্যায়, বিনয়ে, স্থিরতায়, দৃঢ়তায়, নেতৃত্বে, কৃতিত্বে বাঙালী এক কালে কী ছিল, তাঁর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র:

1. অতুলচন্দ্র ঘটক, 'আশুতোষের ছাত্রজীবন' (অষ্টম সংস্করণ), চক্রবর্ত্তী-চ্যাটার্জ্জি এন্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৪ সাল, পৃ. ৪
2. প্যাট্রিক পেটিটজীন, ক্যাথরিন জ্যামি এণ্ড অ্যানি মারিয়া মলিন, সাইন্স এন্ড এম্পায়ার। বোস্টন স্টাডি ইন দ্যা ফিলোজফি অফ সাইন্স, ভলিয়ম-১৩৬. ক্লুবার একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২
3. শশধর সিং, 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ.২০
4. বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ৪থ বর্ষ, ১৩৩২, পৃ.৬২
5. সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষের ছাত্রজীবন, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৯৯
6. অতুলচন্দ্র ঘটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯১
7. বিমলেন্দু কয়াল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ.৩
8. সমাবর্তন ভাষণ ১৯০৭, (অনুবাদ) অনিল বিশ্বাস, আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা।
9. ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কনভোকেশন এড্রেস, ১২ই মার্চ ১৯১০
10. ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কনভোকেশন এড্রেস, ১৯২২
11. সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.১১২
12. Sammadar JN., Sir Asutosh Memorial, Part-I, patliputra, 1926-1928, 11.
13. আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রথম পাতা, ২৭শে মে, ১৯২৪